সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং যাপন

শমীক সরকার

গত শতকের মধ্যভাগের ফরাসী সাহিত্যের ক্ষুদে রাজপুত্তুর ভিনগ্রহ থেকে পৃথিবীর কোনও ধু ধু প্রান্তরে এসে পড়ে প্যাসেঞ্জার ভর্তি আপ ট্রেন আর ডাউন ট্রেন কিছুক্ষণ পরপর যেতে দেখে প্রশ্ন করেছিল, 'ওরা ওরকম হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে ছুটে যাওয়া আসা করছে কেন?' এরকম অবাক প্রশ্ন করার জন্য দার্শনিকরা সেই সময় চাইছিলেন দর্শনের বা চিন্তার এমন কিছু বিষয়ী যে হয়ত ওই ভিনগ্রহ থেকে টপকে পড়া, বা অনেকদিন পর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, বা যে মূর্খ, সুচিন্তক নয়, সু-এর চিন্তক নয়।

১

একটা প্রবাদ আছে, আমরা যা খাই তাই দিয়ে গড়া। যাপন আমাদের গঠন করে। যাপন আমাদের অভ্যাসগুলি গঠন করে এবং সেই অভ্যাসগুলিই হলাম আমরা। অর্থাৎ, যাপনের সঙ্গে তার বিষয়ীর সম্পর্ক পারস্পরিক এবং তা টানাপোড়েনের নয় বা দ্বন্দ্বমূলক নয়। অন্ততঃ হওয়ার কথা নয়। যাপনের দুটি অঙ্গ আছে -- আসল এবং অলীক/ভার্চুয়াল। আসল যাপন মানে আমরা আসলে যা করি, খাই দাই গান গাই। আর অলীক যাপন মানে হল আমরা যা লিখি, যা পড়ি, অপ্রত্যক্ষভাবে শুনি, অপ্রত্যক্ষভাবে দেখি, ... অপ্রত্যক্ষভাবে করি। ঐতিহাসিক সময়ের চোখে অলীক যাপন দেখলে লেখা এবং পড়া হল প্রাথমিক অলীক যাপন। জলে বা আয়নায় মুখ দেখলেই হয়ে যায়, তবে আমরা সেলফি তুলে রাখি কেন? যাতে থেকে যায় মুহর্তটা, সেই কারণে। লেখাও ওই কারণে, যা লেখা হচ্ছে সেই বয়ানটা যাতে রয়ে যায়। আমাদের যাপনেরই একটা অংশ সাজিয়ে রেখে তাকে পরবর্তী যাপনের অংশ করে তোলার মধ্যে দিয়ে হয় অলীক যাপন। আসল যাপন স্বগঠিত। কিন্তু অলীক যাপন কি সংগঠিত না স্বগঠিত? অলীক যাপন নিঃসন্দেহে স্বগঠিত। কিন্তু এর সংগঠিত রূপও আমরা দেখতে পাই। অলীক যাপনের সংগঠিত, প্রস্তরীভূত রূপের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলি— রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় রাজনীতি,

কর্পোরেট, মিডিয়া থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ ইত্যাদি প্রভৃতি। ক্ষমতার রাজনীতি হল এই অলীক যাপনের সংগঠিত রূপগুলি দিয়ে অলীক যাপনের স্বগঠিত রূপগুলিকে উপস্থাপিত করা, এবং আসল যাপনকে যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণ করা। সে অন্য কথা। আমাদের এখনকার প্রাথমিক বিবেচ্য হল— সমাজ কি আমাদের অলীক যাপনের সংগঠিত এবং প্রস্তরীভূত রূপ, মানে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান?

এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সমাজে একটা সংগঠন কাজ করে। বা বলা ভালো, সমাজ একটা সংগঠনকে মান্যতা দেয়। সেটা যখন রাষ্ট্র নয়, তখন অন্য কিছু। তা হতে পারে স্থানীয় পঞ্চায়েত (যার পুলিশ বা সেইরকম কিছু নেই, ফলে রাষ্ট্র নয়)। সেটা হতে পারে একজন বুড়ো মানুষ, বা গণ্যমান্য, বা বেশ কিছু বুড়ো মানুষ। সেই সংগঠন সমাজ থেকে তৈরি করা হয়। যারা সমাজের এই সংগঠন, তারা অতীত ছেনে উদাহরন দিয়ে এখনকার অবস্থা বুঝতে-বোঝাতে পারে, তারা কী-করা-উচিত এবং কী-করা-উচিত না তার শক্তিশালী মরাল নিয়ে চলতে জানে, তারা বিভিন্ন অপ্রত্যক্ষতা সৃজনে করিতকর্মা ইত্যাদি। অর্থাৎ, এই সংগঠন আগে আমরা যেটা বললাম, সেই অলীক যাপনেরই সংগঠিত রূপ। পার্থক্যটা হয়ত, এইসব অলীক যাপন প্রথমে স্বগঠিত; পরে সেইগুলিকেই ব্যবহার করা হল সংগঠনে। এসব ক্ষেত্রে সমাজের সংগঠনটি বানানো, কিন্তু স্বগঠিত অলীক যাপনগুলির ওপর দাঁড়িয়ে। এটাকে অনেকে বলবেন সমাজের সংগঠিত স্বগঠন। সমাজে স্বগঠিত অলীক যাপনগুলির ওপর দাঁড়িয়ে সংগঠন। যারা মনে করেন, সংগঠন থাকতেই হবে, তারা সাধারণতঃ এই ধরনের সংগঠনকে সমর্থন করেন। সমাজ যে সংগঠনকে মেনে নেয় সেগুলো এরকম। এগুলোকে বলে সামাজিক সংগঠন। ক্ষমতার রাজনীতি এই সংগঠনগুলির নেই বা থাকার কথা নয়। অর্থাৎ এই সংগঠনগুলি নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থে আসল যাপনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। সমাজের সংগঠনে আসার জন্য ব্যক্তিরা অলীক যাপন সংগঠিত করে না। যদি করে, তাহলে সামাজিক সংগঠনটি আর সামাজিক সংগঠন থাকে না। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অংশ হয়ে যায়।

যেমন, পঞ্চায়েত ছিল একটা সামাজিক সংগঠন। ত্রিস্তরীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত আসার পরে বা পঞ্চায়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত আর সামাজিক সংগঠন রইল না, হয়ে গেল ক্ষমতার সংগঠন বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন। গান্ধীজী ব্রিটিশ বিদায়ের পর কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দল তুলে দিয়ে শুধু সেবাদল হিসেবে থাকতে বলেছিলেন (কংগ্রেস পাত্তা দেয়নি)। মাঝে মাঝে আওয়াজ শোনা যায়, পার্টিবিহীন পঞ্চায়েত হোক (হয় না)। আমরা দেখি, রাষ্ট্র ক্রমশঃ সমাজের সবরকমের সংগঠনকে গিলে নেয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে

নয়াউদারবাদের তাত্ত্বিকরা সওয়াল করেছিলেন, রাষ্ট্রের কাজ হবে সামাজিক সংগঠনগুলির ন্যায্যতা অন্যায্যতা নির্ধারণ করা। সেই মতোই হয়েছে। নয়াউদারবাদী রাষ্ট্র কয়েক দশকে সামাজিক সংগঠনগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। প্রায় প্রতিটি সামাজিক সংগঠন ক্ষমতার রাজনীতির অংশ যদি না হয়ে ওঠে, তাহলে টিকতেই পারবে না। আর ক্ষমতার রাজনীতির প্রতিস্পর্ধী হতে গেলে তাকে সবলে ধ্বংস করে ফেলা হবে। হয়তো উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল মণিপুর, যেখানে গত তিন দশকে সামাজিক সংগঠনগুলি শক্তিশালী হয়েছে রাষ্ট্রের তুলনায়। কিন্তু মণিপুরে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি একেবারেই বাইরের থেকে আসা, ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে তো বটেই, ভারতীয় সমাজের সঙ্গেও মণিপুরী সমাজের বিচ্ছিন্নতা সর্বজনবিদিত। ভারতীয় সমাজ আদ্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক। মণিপুরী সমাজ অনেকটাই মাতৃতান্ত্রিক। এই পটভূমিতে, এবং শক্তিশালী জনআন্দোলনের (আসাম রাইফেলস-এর হেড কোয়ার্টারের সামনে মেয়েদের নগ্ন প্রতিবাদ সহ ব্যাপক জনজাগরণ) রেশ টেনে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি পিছু হটেছিল হয়ত। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মহিলা গ্রামরক্ষী বাহিনী মেইরা পাইবি থেকে শুরু করে আপুনবা লুপ, মণিপুরের সমস্ত সামাজিক সংগঠনগুলি আসলে একটি মণিপুরী (বা মৈতেয়ী) রাষ্ট্রীয় রাজনীতি নির্মাণের অংশ হয়ে উঠেছে গত দু-দশকে। অর্থাৎ, ক্ষমতার রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় রাজনীতি মানে একটা ক্ষমতা বা রাষ্ট্র নয়। সে যেন হাইড্রা-হেডেড। এখন সেই মণিপুরী রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে আত্মসাৎ হয়ে যাওয়া সামাজিক সংগঠনগুলির সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় রাজনীতির ফাইট শুরু হয়েছে।

সামাজিক সংগঠন বাদ দিয়ে কি সমাজকে ভাবা যেতে পারে? এইটা লাখটাকার প্রশ্ন। এইখানেই চলে আসবে যে প্রশ্নটা আমরা করতে চাইছিলাম না সেই প্রশ্নটা— সমাজ কী? এবং এই প্রশ্নের উত্তরের নিরিখে উত্তর খোঁজা হবে আগের লাখটাকার প্রশ্নটার। মুশকিল হল, কী দিয়ে প্রশ্ন মোটেই অবাক প্রশ্ন নয়। কী দিয়ে প্রশ্ন সাধারণত রিকগনাইজ বা চেনা-র চাহিদা থেকে হয়। চেনা মানে হল, আগে থেকে চেনা কিছুর সঙ্গে মেলানো। সে কারণেই আমরা 'সমাজ কী' এই প্রশ্নটা করতে চাই না। সামাজিক সংগঠন বাদ দিয়ে সমাজকে ভাবা যায়, এটা আমরা ধরে নেব। এটা ইতিহাস জ্ঞানের ব্যাপারও নয়। ইতিহাসে যদি এর উদাহরন না-ও থাকে, তাহলেও যায় বলে ধরে নেব। কারণ, ওই যে বললাম, যা ইতিহাসে হয়েছে কেবলমাত্র তা-ই হবে ভাবলে আসলে রিকগনাইজ বা চেনা-র খপ্পরে পড়ে যাওয়া। ইতিহাস সবসময়ই অনৈতিহাসিক, বা ইতিহাস কখনও ইতিহাস মেনে হয় না। সমাজভাবনার মূলে যদি অবাক ভাবনা না থাকে, তাহলে তা সমাজভাবনা নয়, ইতিহাসের দাসত্ব।

কথা পত্রিকার আত্মপরিচিতির সন্ধানে সংখ্যায় অমিতদা একটা বয়ান রেখেছিলেন— আমাদের সমাজকাঠামো সম্পর্কে। 'দ্বন্দ্ব' নামক একটি বিশ্লেষণী অক্ষ-র ওপর ভিত্তি করে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, সমাজে মূল তিন প্রকার আত্মপরিচয়মূলক দ্বন্দ্ব আছে— ব্যক্তি বনাম সামাজিক যৌথতা, বংশানুক্রমিক পরিচিতি বনাম সভ্যতা থেকে জন্ম নেওয়া স্থানিক/ধর্মীয়/ভাষাগত/বর্ণগত/জাতিগত পরিচয়, এবং পূর্বতন পরিচয় বনাম নতুন পরিচয়। প্রাকঔপনিবেশিক সময় অবধি আমাদের সমাজ চলেছে রক্তসম্পর্কিত মানুষদের একসঙ্গে থাকার মধ্যে দিয়ে। হতে পারে, পেশাগত বংশানুক্রমিকতা বা বংশানুক্রমিক পেশা এর কারণ— কিন্তু এই 'ব্যবস্থা'র মধ্যে দিয়ে চলা সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে, যার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনের বৃদ্ধি অব্যাহত থেকেছে, অন্যদিকে অসমতা থাকলেও কারোর অভাব হয়নি। এই টেঁকসই ব্যবস্থা একদিক থেকে দেখলে স্থবিরতা বটে। দেশীয় সামন্ত ব্যবস্থার গড়ে ওঠা বা শক-হুন-পাঠান-মোগল-এর আগমনেও এই ব্যবস্থা বা 'প্রচলন' ব্যাহত হয়নি, বরং তারাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এর মধ্যে। তবে ইসলামের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে এই সমাজ ব্যবস্থা যে আদতে একটি 'ব্যবস্থা' তার চেতনা তথা প্রশ্ন তৈরি হয় প্রথম। তবে প্রশ্ন উঠলেও প্রচলন ব্যহত হয়নি, সম্ভবতঃ উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হবার কারণেই। আত্মপরিচয়গত দ্বন্দ্বগুলি ভোঁতা হয়ে যায় এই ব্যবস্থায়— সমাজ থেকে ব্যক্তি পৃথক অস্তিত্ব বোধ করে না, কারণ সমাজ ব্যক্তিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যেও নানা স্বতন্ত্র প্রথার মধ্যে দিয়ে; স্থানিকভাবে একসঙ্গে থাকা ও দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রথা প্রচলনের মধ্যে দিয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাবার ফলে সভ্যতাগত পরিচয়ের সঙ্গে বংশানুক্রমিক পরিচয়ের দ্বন্দ্ব কাজ করে না; বর্ণব্যবস্থার স্থায়ী প্রথাকরণের মধ্যে দিয়ে পূর্ব ও বর্তমান পরিচয়ের কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না। ঔপনিবেশিকতার কালপর্বে শ্রমিক, সেকুলার ইত্যাদি বহিরাগত পরিচয় তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু এই শ্রমিক সর্বহারা নয়, তার বিপদের তরণী হিসেবে রয়ে গেছে তার ফেলে আসা গ্রামের ঘর-পাড়া-আত্মীয়স্বজন। অপরপক্ষে বহিরাগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত শ্রেণী যেমন সেকুলার হবার সুবিধা নিয়েছে তেমনি বর্ণব্যবস্থার থাকবন্দীতে ওপরে থাকার সুবিধাও নিয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের সমাজ নামক টেঁকসই বন্দোবস্ত রয়ে গেছে অমলিন, স্থবির। অমিতদা তার লেখায় উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে রক্ষিত হয় জাতভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তা ব্যাখ্যা করেননি। আমরা তার একটা আন্দাজ এখানে সংক্ষেপে রাখছি। কৌম উৎপাদন পদ্ধতিতে যে কাজ করে এবং যে

কাজ করায় তাদের মধ্যে অর্থনীতি বহির্ভূত নৈকট্য থাকে। ফলে যে কাজ করায় সে উদবৃত্ত আত্মসাৎ করলেও তা কৌম ছেড়ে পালিয়ে যায় না, তার একটি ভাগ কৌম পায় এবং তার মাধ্যমে যে কাজ করে সে-ও পায়। আবার উৎপাদন পদ্ধতিটি জটিল যন্ত্রনির্ভর না হওয়ার কারণে উদবৃত্ত জটিল যন্ত্রেও আত্মসাৎ হয়ে যায় না, তার মেটেরিয়াল বা মাটিরূপ অক্ষত থাকে কোনও না কোনও ভাবে, ফলে তা যে কাজ করায় তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত হওয়া মুশকিল হয়। নৈকট্য ও আত্মীয়তার কারণে এবং উদবৃত্তের আত্মসাৎ কম হবার কারণে যারা কাজ করে তারাও এই উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ককে বিচলিত করে না। যাই হোক, অমিতদা মার্ক্সের রিলিজিয়ন বা ধর্মকে দেওয়া বিশেষণ 'হার্ট অফ দ্য হার্টলেস' উদ্ধৃত করে বলেছেন, বহিরাগত বা 'ইউরোপিয়' আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনী ব্যবস্থা (যা উৎপাদনী ব্যবস্থার মধ্যে সমাজকে ধারন করে) তুলনায় এই সমাজব্যবস্থা যা উৎপাদনকে তার মধ্যে ধারন করে তা অনেক বেশি হৃদয়যুক্ত, নিরাপদ।

সমাজ কাঠামো, সমাজ ব্যবস্থা এসব শব্দবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, এই সমাজ সংগঠিত। বর্ণব্যবস্থার প্রথাকরণ থেকে শুরু করে বিয়ে ইত্যাদি সংস্কারের নানা প্রথা— তা থেকে বোঝা যায়, সমাজ শুধু সংগঠিত নয়, তার সংগঠন রীতিমতো গ্রন্থিত। হ্যাঁ, আমরা যে আমাদের প্রাকঔপনিবেশিক সমাজের কথা বলে থাকি, তা সংগঠিত এবং গ্রন্থিত। আমরা লেখা ও পড়া-কে বলেছিলাম প্রথম অলীক যাপন। ইতিহাসের আবিষ্কার থেকে দেখা যায়, সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার মেসোপটেমিয়া বা এখনকার ইরাক হল প্রথম লেখার জায়গা। তার কিছু পরেই পড়শি দেশের সিন্ধু সভ্যতা। কিন্তু লেখা ও পড়ার চেয়েও পুরনো অলীক যাপনের কথা জানা যায়— শ্রুতি বা শুনে শুনে মনে রাখা। স্মৃতিকে ধরে রাখা। আর সমাজব্যবস্থা হল প্রাকাধুনিক উৎপাদনী ব্যবস্থার সংগঠন মাত্র। জাতের উৎস কী তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে— কেউ বলে বংশ, কেউ বলে ট্রাইব, কেউ বলে শ্রমবিভাজন। বংশের সঙ্গে গোত্র মিললেও জাত মেলে না তেমন। আর ট্রাইব জাতব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়েছে হয়ত, কিন্তু ট্রাইব থেকে জাত আসেনি। আমরা জাতব্যবস্থা বলতে একটি শ্রমবিভাজন ব্যবস্থাকেই বুঝব, জন্মগত শ্রমবিভাজন। আমাদের জাতভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দুই প্রধান সমালোচক আম্বেদকর এবং লোহিয়া। আম্বেদকর বলেছিলেন, জাত শুধু শ্রমবিভাজন নয়, শ্রমিকবিভাজন। অর্থাৎ, জাত হল ব্যক্তিক শ্রমবিভাজন। লোহিয়া বলেছিলেন, জাতব্যবস্থা হল 'পাঁচ হাজার বছর ধরে চলা কর্মক্ষমতার বাছাইকরণ' (সিলেকশন অফ অ্যাবিলিটিজ)। কে কী করতে পারবে এবং কে কী করতে পারবে না, তা তার জন্ম দিয়ে বাছাই করা। স্বাভাবিকভাবেই করতে পারবে কথাটার ব্যবহারিক অর্থ হল— করবে। আর কাজের দর্শনে করতে পারবে হল শ্রমক্ষমতার বাছবিচার। আমরা জানি 'করা'

অর্থনীতির আওতায় আসে 'করতে পারা' দিয়ে, 'করা' দিয়ে নয়। খরিদ হয় শ্রমক্ষমতা।

আঠাশ বছরের মার্ক্সের 'জার্মান ভাবাদর্শ'-র নোট-এ পাওয়া যায় কমিউনিস্ট সমাজের ইউটোপিয়া— শ্রমবিভাজনের অবসান। কিন্তু শ্রম কি এই মার্ক্সে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত? না, দু-বছর আগেই মার্ক্স ফ্রান্সে বসে নোটে লিখেছেন, এ কেমন বিষয় অর্থনীতি, যেখানে মানুষ শুধু বিমূর্ত পণ্যায়িত শ্রম? শ্রমিক বলে কি মানুষ নয়? ইংলন্ডের শ্রমিক মহল্লায় ঠেক মেরে বেড়ানো 'জার্মান ভাবাদর্শ-র সময়কার মার্ক্সের 'শ্রম' কীভাবে বিমূর্ত হতে পারে? তা নয়ও। মার্ক্স তাই শ্রমবিভাজনকে দাঁড় করান লম্বা-ইতিহাসের (বিগ-হিস্টরি) বয়ানে— প্রথম শ্রমবিভাজন হল যখন মেয়েরা সন্তান উৎপাদনের শ্রমে বা 'যৌন শ্রমের শ্রম বিভাজনে' নিয়োজিত হল মানুষের প্রাকৃতিক-সামাজিক জীবনধারার সন্ধিক্ষণে, যখন মানুষ যূথবদ্ধ জীবেরই মতো, শুধু মানুষ আর ভেড়ার তফাত হল 'সচেতনতা এখানে জায়গা নিয়েছে প্রবৃত্তির'; এই শ্রমবিভাজন যদি বা স্বতস্ফূর্ত হয়, এরপর যখন মাটির শ্রম আর মাথার শ্রমের বিভাজন হল তখন তা একেবারেই বাঁটোয়ারা। ইতিহাসের বয়ানে আর এগোননি মার্ক্স 'জার্মান ভাবাদর্শ'-তে, ফিরে গেছেন দার্শনিক বিশ্লেষণে— যতক্ষণ এই 'প্রাকৃতিক' সমাজে মানুষ আছে, যেখানে সক্রিয়তা স্বেচ্ছামূলকভাবে নয়, 'প্রাকৃতিক'ভাবে বিভাজিত, সেখানে মানুষের কৃতকর্ম আর মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ক্ষমতা হয়ে, তার কৃতকর্ম তাকে দাসে পরিণত করে; শ্রমবিভাজন যেই ঘটল, প্রতিটি মানুষের একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র তৈরি হল, যা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া, এবং যা থেকে তার মুক্তি নেই; সে হয় শিকারী, বা জেলে, বা মেষপালক, বা সাহিত্য-সমালোচক, এবং তাকে তা-ই থাকতে হবে যদি জীবনধারন করতে হয়।'জার্মান ভাবাদর্শ'-তে মার্ক্সের শ্রমবিভাজনের অবসানের ইউটোপিয়া আসলে শ্রমক্ষমতার বিভাজনের অবসান, শ্রমিকবিভাজনের অবসান— 'কমিউনিস্ট' সমাজে কারোর কোনও বিশেষ ক্ষেত্র নেই সক্রিয়তার, সেখানে আমি চাইলেই আজ এই কাজ করি তো কাল অন্য কাজ করি, এমনকি সকালে শিকার করে দুপুরে মাছ ধরে বিকেলে গোরু চরিয়ে আবার সন্ধ্যেবেলা সাহিত্য-সমালোচনায় বসে যাই, এর জন্য আমায় শিকারি বা জেলে বা গোপাল বা বাচস্পতি হতে হয় না। সমাজ মানে উৎপাদন-বন্টন ব্যবস্থা— তা সে আধুনিক হোক বা প্রাগাধুনিক— 'জীবনের উৎপাদন, তা সে শ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজের হোক বা সন্তান উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে নতুন জীবন, এখন তা যেন মনে হয় দ্বিত (ডাবল) সম্পর্ক একদিকে তা প্রাকৃতিক, অন্যদিকে তা সামাজিক। সামাজিক বলতে আমরা বুঝি বহু ব্যক্তির সহযোগিতা, তা সে যে শর্তেই হোক আর যেভাবেই হোক আর যে উদ্দেশ্যেই

হোক। এর থেকে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা বা শিল্পের স্তর সবসময় সংযুক্ত থাকে একটা নির্দিষ্ট সহযোগিতার ব্যবস্থার সঙ্গে, বা সামাজিক স্তরের সঙ্গে। এবং এই সহযোগিতার ব্যবস্থাটিই হল "উৎপাদিকা শক্তি"। আরো বলা যায়, এই উৎপাদিকা শক্তির সমাহারের কতটা পাচ্ছে মানুষ তা দিয়েই নির্ধারিত হয় সমাজের চরিত্র। তাই "মানবতার ইতিহাস" সবসময় পড়তে হবে শিল্প এবং বিনিময়ের-এর ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে।' এবং যখনই সে উৎপাদন ব্যবস্থা, তখনই সে শ্রমক্ষমতার বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে। মানুষের শুধুমাত্র প্রাকৃতিক অস্তিত্বে শ্রমবিভাজন ছিল না, কিন্তু প্রাকৃতিক-সামাজিক অস্তিত্ব যেই না শুরু হল— শুরু হল শ্রমবিভাজন। মার্ক্স এই সন্ধিক্ষণকে ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট করেননি, কিন্তু সংজ্ঞাগতভাবে নির্দিষ্ট করেছেন জার্মান ভাবাদর্শের বিশ্লেষণের শুরুতেই — মানুষ নিজের সঙ্গে জন্তুর তফাত করতে পারল তখনই যখন মানুষ নিজের যা প্রয়োজন তা উৎপাদন করে নিতে শুরু করল। মার্ক্সের বিমূর্ত 'শ্রম' এর ধারনা তৈরি শুরু হচ্ছে আরও এক বছর পর থেকে (মজুরি, শ্রম, পুঁজি প্যামফ্লেট প্রকাশ), আরও দশ বছর পরে তা রূপ পাচ্ছে 'গ্রুন্ডরিসে' নোটবই-তে। তা তখন পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমালোচনা। তখন মার্ক্স শ্রমিক মহল্লায় যত না ঠেক মারেন, তার চেয়ে বেশি লাইব্রেরি-ওয়র্ক করে— পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত শ্রমিকশ্রেণীর হাতে পণ্ডিতি অস্ত্র তুলে দেওয়ার প্রয়াসে।

আমাদের প্রাকঔপনিবেশিক তথা আদিকাল থেকে চলে আসা কর্মক্ষমতার বাছাইকরণ তাই অর্থনীতিরই সজ্জা, উৎপাদন-ভিত্তিক অর্থনীতির সজ্জা। ফলে জাত, বা জাতব্যবস্থা, বা জাতভিত্তিক সমাজব্যবস্থা হল আসলে অর্থনীতির সজ্জা। আমাদের সনাতনী সমাজ'ব্যবস্থা' হল একধরনের অর্থনৈতিক সংগঠন। অর্থনীতি কোনওকালেই শুধু উৎপাদন ছিল না বা হতেও পারে না। উৎপাদন-বন্টন-ভোগ — যাতে অন্তর্লীন থাকবে বিনিময়— এই তিনে মিলে অর্থনীতি। অর্থনীতিকে অনেকসময় মনে হয় যেন বা আধুনিক কারখানা ও শিল্প উৎপাদনের সমসাময়িক। কিন্তু মোটেই তা নয়। কৃষি ও কারিগর ব্যবস্থা হল অর্থনীতির আদি— যখন থেকে উৎপাদন-বন্টন-ভোগ এর ত্রৈকা সমাজের পরিপাকতন্ত্রে পাকাপাকি আসন গেঁড়ে নিল। সনাতন সমাজ সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সংগঠনের ব্যবস্থা। আমরা গত শতকের নয়াউদারবাদী দর্শনের নিন্দা করি, কারণ তা অর্থনৈতিক সমাজ, অর্থনৈতিক মানুষের ধারনাকে প্রোথিত করবে সর্বত্র, সার্বিকভাবে। কিন্তু আমাদের সনাতন সমাজ-ও আপাদমস্তক অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ও অর্থনৈতিক মানুষের সর্বাত্মকতাবাদী সংগঠন।

কীভাবে অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ও অর্থনৈতিক মানুষের ধারনা সর্বাত্মকতা লাভ করেছিল? না, আধিভৌতিক রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে করেনি। করেছিল অলীক এবং

আসল যাপন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে। মানুষ মূলতঃ প্রাকৃতিক অস্তিত্ব থেকে মূলতঃ সামাজিক অস্তিত্বে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছিল কৃষি-কারিগরি ব্যবস্থার পত্তনের মধ্যে দিয়ে। এই পরিবর্তন এক দিনে বা এক বছরে বা একশ' বছরে হয়নি, দীর্ঘ ঐতিহাসিক সময় ধরে টানাটানি চলার পর হয়েছে। শুরুর সময় থেকেই একটি অর্থনীতি মানুষের অলীক ও আসল যাপন নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল সম্ভবতঃ সুগঠিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই। কীভাবে হয়েছিল তা ইতিহাস খুঁড়ে বের করার কথা ভাবা যেতে পারে, কিন্তু তাকে সামাজিক ব্যবস্থা ধরে নিয়ে সে সন্ধান করলে হবে না। এটুকু বলা যায়, রীতি-প্রথা-প্রচলন-অভ্যেস-সংস্কার-আচার— এগুলো ছিল ওই নিয়ন্ত্রণেরই অঙ্গ। নানা শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকার ছিল, এবং সমাজে তাদের নিরঙ্কুশ দাপট-ও ছিল। আমাদের দেশের নিয়ন্ত্রিত যাপনে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা জনমানুষকে লোহিয়া বলেছিলেন, 'দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী জনতা'। স্বাধীনতার পরে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ও ষাটের দশকের শুরুর দিকে জাত 'ধ্বংস' করার জন্য নানা উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল। লোহিয়ারা সেগুলোতে প্রস্তাব নিয়েছিলেন— সরকারি চাকরি পাবার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হতে হবে ভিন্ন জাতে বিয়ে এবং সেটা সাব-কাস্টের মধ্যে হলে চলবে না; আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক নারী সাবিত্রী নয়, দ্রৌপদী; দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত দশ -এর বেশি হওয়া চলবে না; মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব নয়, পড়াশুনা করানো এবং স্বাস্থ্য ঠিক রাখা অবধি তাদের দায়িত্ব; আমূল ভূমি সংস্কার; উপাধির বিনাশ; সর্বজনীন পংক্তিভোজন; ভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ের প্রসার; গায়ের রং সৌন্দর্যের মাপকাঠি নয়। লোহিয়ার স্পষ্ট উক্তি ছিল— জাত মানুষকে তার কর্মক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের মধ্যে দিয়ে একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন বা টিকে থাকা নিশ্চিত হতে পারে বটে— কিন্তু তা ছাড়াও পারে। কীভাবে পারে তা মার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে গ্রামশি-তে আছে; বাইরে ফুকো সহ আরো অনেকের লেখায় আছে।

আমাদের সংবিধানে জাত-ভিত্তিক একটি আচার অস্পৃশ্যতাকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, কিন্তু জাতের মূল যে জন্মগত শ্রমবিভাজন তার উচ্ছেদের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে বাম আন্দোলনে জাত-কে শ্রমবিভাজন হিসেবে দেখা হয়নি, দেখা হয়েছিল শুধুই অস্পৃশ্যতার আঙ্গিকে। গত শতকের আশি সালে যখন মন্ডল কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জানতে চায়, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ জাতবর্গগুলি কী কী, তখন অশোক মিত্র-র নেতৃত্বে একটি কমিশন বসিয়ে সেই কমিশনের রেকমেন্ডেশনই পাঠানো হয়েছিল মন্ডল কমিশনের কাছে, যাতে বলা হয়েছিল— পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাত-কে পশ্চাদপদতার সূচক হিসেবে দেখে না, শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি পেশাবর্গ-কে দেখে (অর্থাৎ, জাত আর পেশাবর্গ

আলাদা ব্যাপার)। কবিতা/গানে ধরা হয়েছিল— "কি আমাদের জাত আর ধর্মই বা কি/ মাটি ছেনে যখন ইটের পাঁজা বানাচ্ছি"। মার্ক্সবাদীরা কেন জাত-কে অর্থনীতির আঙ্গিক বাদ দিয়ে দেখেছিল তা যারপরনাই আশ্চর্যের।

৩

সমাজভাবনার ইতিবৃত্ত কখনও একটা বা দুটো লেখার বিষয় নয়। আমরা আঠাশ বছরের মার্ক্সের 'কমিউনিস্ট' ইউটোপিয়ার সমাজ-কে ধরতে পারি আমাদের সাধের সমাজ— যেখানে কোনও কিছু করার জন্য কোনও কিছু হতে হয় না, যে কেউ যখন খুশি যা খুশি করতে পারে। আবার মার্ক্সের এই ভবিষ্যতের 'কমিউনিস্ট' সমাজ সংগঠিত, স্বগঠিত নয়। এইখানে আমরা মার্ক্সের সঙ্গে একমত নই। বরং আমরা মনে করি আসল এবং অলীক যাপন স্বগঠিত, তার যে কোনও সংগঠন তার স্বগঠনকে বিচলিত করে। এইখানে কয়েকটা মন্তব্য আমাদের আছে

ক) বলাই বাহুল্য, বর্তমানে অলীক যাপনের অনেকটাই সংগঠিত এবং এই সংগঠনের দাপট আমাদের অলীক ও আসল যাপনের ওপর বাড়ছে। তাই আমরা মনে করি সেইসব সংগঠনের মধ্যেও আমাদের সেই সমস্ত পদ্ধতিগুলিকে শক্তিশালী করা দরকার যেগুলো এই সংগঠনগুলিকে দুর্বল করে। এই সংগঠনগুলি বেশিরভাগ সময়তেই স্বগঠনগুলি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে। পদ্ধতিগতভাবেই তা যাতে কম হয় তার জন্য সচেতন চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেমন, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যাবলীতে মানুষের ভূমিকা কমিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা বাড়ানোর দাবি করা প্রয়োজন। সংগঠিত অলীক যাপন যাতে প্রত্যেকের সহজলভ্য হয় তা পদ্ধতিগতভাবে নিশ্চিত করার দাবি করা প্রয়োজন। যেমন, সমস্ত শিক্ষামূলক বই, দৃশ্য-শ্রাব্য শিক্ষণব্যবস্থা, পরিকাঠামো-মূলক সফট-ওয়র প্রোগ্রাম (কোড সহ), মেশিনের থ্রিডি প্রিন্টিং ডিজাইন পাবলিক ডোমেইন বা সর্বজনীন করার দাবি করা প্রয়োজন।

খ) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমতার ইঞ্জিন বাস্তবায়নের দাবি করা প্রয়োজন, যা জাত সহ সমস্ত পরিচিতি-নির্ভর বাছবিছারকে ক্রমে ধ্বংস করবে। সমস্ত পরিচিতি ভিত্তিক উন্নয়ন/নিরাপত্তা/স্বাধীনতার খতিয়ান কিছু বছর পর পরই জনগণনার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হবে এবং যে সমস্ত পরিচিতি দেখা যাবে পিছিয়ে রয়েছে বা পিছিয়ে পড়েছে, তাদের বিশেষ বন্দোবস্তের মাধ্যমে দ্রুতপদে এগিয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত করা হবে— এটাই সমতার ইঞ্জিন। জিডিপি বা উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, সমতাকে অর্থনীতির ইঞ্জিন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

গ) সাবসিস্টেন্স বা টিকে থাকার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে হবে এবং সাবসিস্টেন্স বা টিকে থাকাকে অর্থনীতি-বহির্ভূত সর্বজনীন বা সবার প্রাপ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, তাকে পণ্য বা বিনিময়ের আওতায় রাখা চলবে না।

ঘ) গত কয়েক শতকে অলীক যাপনের এক্সপোনেনশিয়াল বা সূচকীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। দেখানো যায়, তার মধ্যে দিয়ে আমরা আর সামাজিক প্রাণী নেই, মনোসামাজিক প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। মনোসামাজিক প্রবাহী অস্তিত্বের সংগঠন খুবই কঠিন। ফলে সমস্ত ধরনের সংগঠন এমনিতেই নানা সমস্যায় রয়েছে। আমরা জানি, সমস্যা যখন পলিটিক্যালি বা সাংগঠনিকভাবে সমাধান করা যায় না, তখন যুদ্ধকে সমাধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে আমরা চারিদিকে বহু ছোটো বড়ো যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি, তা 'মাওবাদী'দের বিরুদ্ধে আপন রাষ্ট্রের যুদ্ধই হোক, বা কুকি আর মৈতেই-দের মধ্যেকার যুদ্ধই হোক, বা পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই, এই যুদ্ধ বহরে না হলেও গতরে আরো বাড়বে— নানা জায়গায় নানা ফিকিরে। এই পরিস্থিতিতে জীবন বা প্রাণের গুরুত্ব আলাদা চেতনা হিসেবে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রাণ জাগতিকভাবে তৈরি করা যায় না, তাই প্রাণ নেওয়াও যায় না।

ঙ) বেশ কিছু শ্রমবিভাজনকে প্রাকৃতিক বলে বলা হয়ে থাকে। অলীক যাপনের বাড়বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে এর মোকাবিলা করা সম্ভব। তা আগেই দেখা গেছে— যেমন, জটিল মেশিনের ব্যবহারে মধ্যে দিয়ে তথাকথিত ভারী কাজে 'প্রাকৃতিক ভাবে কম শক্তিশালী' মানুষেরা (যেমন, মেয়েরা) ঢুকে পড়তে পেরেছে।

৪

বলা হয়, ধর্ম, আদর্শ ইত্যাদিগুলি সমাজের আঠার কাজ করে। আমরা মনে করি যাপন নিজেই আঠা। যাপন বৈশিষ্ট্যগতভাবেই পরস্পরনির্ভরশীলতা এবং আংশিকতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। যাপন কখনোই ব্যক্তিক নয়, অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের নানা সময়ের নানা চলন কখনোই ব্যক্তির নিজস্ব নয়। তার বাহ্যিক পরিপার্শ্বগত জটিলতা এবং তার আভ্যন্তরীন স্বাস্থ্যগত জটিলতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিকেই যা কিছু করতে দেখা যায়, বা, যাপনের প্রকাশ যেহেতু ব্যক্তিক, তাই যাপনের বয়ান হয়ে যায় ব্যক্তিক। সমাজভাবনায় সমাজ-ও তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা। ব্যক্তির স্বাভাবিক আনতাবড়ি (ইনকনসিস্টেন্ট) যাপন সমাজভাবনায় ঠাঁই পায় না। নয়াউদারবাদের তাত্ত্বিক হায়েক সঠিকভাবেই সমালোচনা করেছিলেন, সমাজবাদীরা ধরে নেয় ব্যক্তি মানুষ যৌক্তিক সত্ত্বা, কিন্তু আসলে তা নয়। কিন্তু এই সমালোচনার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি অর্থনৈতিক সংগঠনকে সামাজিক সংগঠনের চেয়ে মহত্তর বলে বর্ণনা করেছিলেন। সামাজিক না অর্থনৈতিক এই দ্বৈত (বাইনারি) ঘোর বাস্তব, কিন্তু এর বাইরে থেকেও অবাক চোখে দেখা যায়— যাপনের অব্যক্তিক বয়ান এবং ব্যক্তি মানুষকে আড়ব্যক্তি হিসেবে দেখা আশু প্রয়োজন।

কথা

দ্বাবিংশ বর্ষ • তৃতীয়-চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা

ক্রোড়পত্র

প্রসঙ্গ সমাজ

পরাঙ্মুখ

আন সেকুলার

সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং যাপন

বিপ্লবী অন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের আশায় কিছু ভাবনা

মার্ক্স-এর চিন্তা এক নতুন বিভ্রাটের পদধ্বনি

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানব-বিকাশ নিয়ে কিছু ভাবনা

টেকনোফিউডালিজম নাকি পুঁজিবাদের নতুন মুখ?

যেটুকু বিকল্প আমাদের এখনই প্রয়োজন

উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা: শহর মে কার্ফু

ইতিহাসে নারীবাদ

ফ্যাসিবাদ- সেকাল ও একাল

চীনা রূপে সন্তবানি যুগে যুগে